প্রেতাত্মা

গোলাম মোসাব্বির

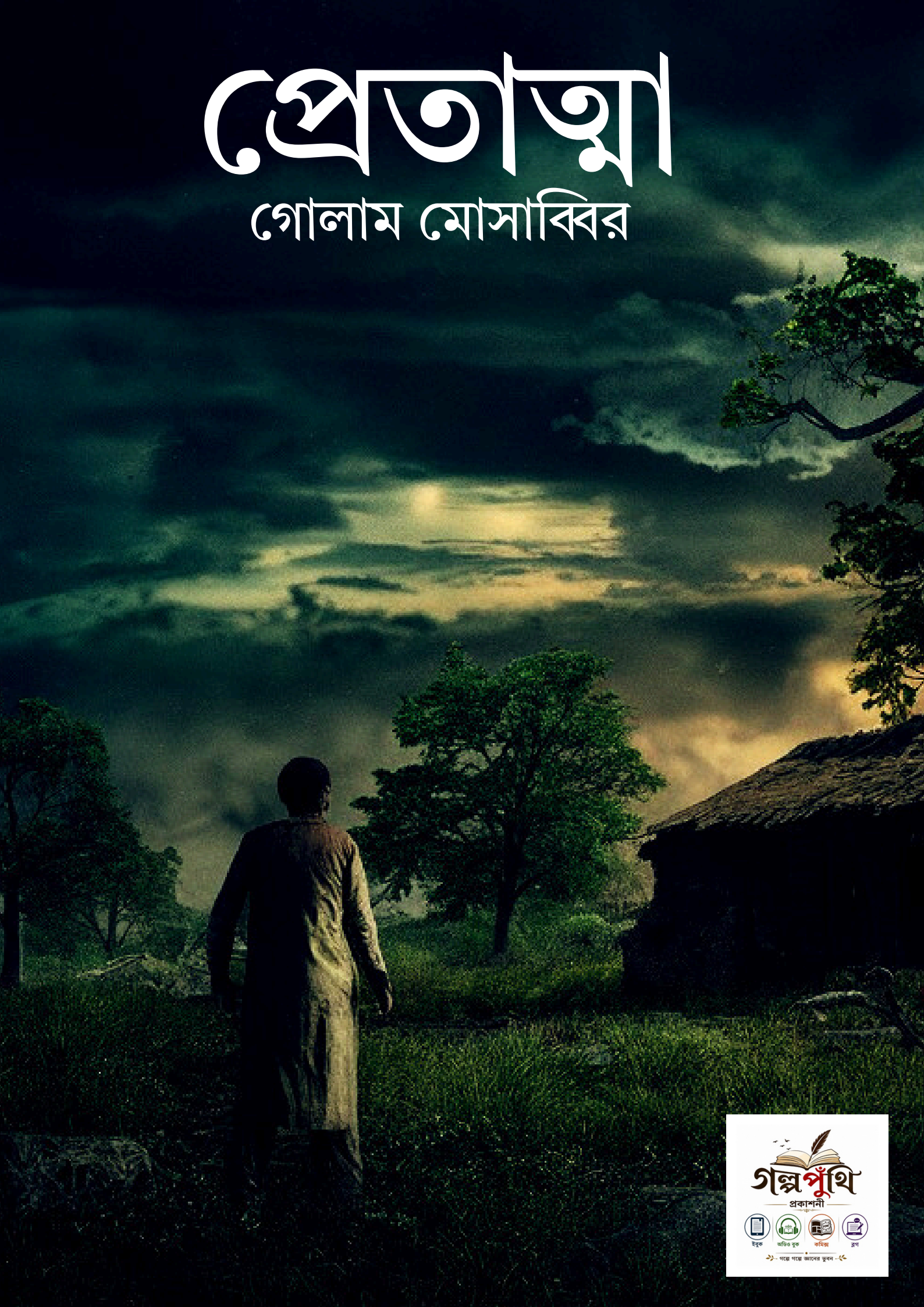

গল্পপুঁথি
প্রকাশনী
ইবুক অডিও বুক কমিক্স ব্লগ
গল্পে গল্পে জ্ঞানের ভুবন

প্রেত্নাতা

১.

অনেক অনেক বছর আগের কথা। তখন রসুলপুর নামের সুন্দর একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামটি ছিল একটি অজপাড়া গাঁ, যেখানে সন্ধ্যা হলেই নিশি ভর করতো। এই গ্রামের মাঝেই ছিল নব নির্মিত একটি দোতলা বাড়ি। রসুলপুরের সারা গ্রামে যেখানে ছনের বেড়া ও টিনের ঘর ছিল, সেখানে একমাত্র দোতলা বাড়িটি ছিল রহমত আলীর। রহমত আলী একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সারাদেশেই তামাক ব্যবসার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাই তিনি শখ করে নিজের গ্রামে একটি দোতলা বাড়ি নির্মাণ করেন। যদিও তখনকার সময়ে একটি বাড়ি থেকে আরেকটি বাড়ির দূরত্ব ছিল কয়েক কিলোমিটার। তাই সেসময়কালে সন্ধ্যা নামার আগে আগেই সবাই যার যার বাড়িতে চলে যেতো। আর তখন সন্ধ্যা হলেই সারা গ্রাম একেবারে নিরব নিস্তব্ধ হয়ে যেত। বলা যায় তখনকার সময়ের সন্ধ্যা ৬টা বা ৭টা বাজলেই গ্রামের মানুষগুলো ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নিতো। কারণ সেসময়ের গ্রামের মানুষজন সন্ধ্যা হলেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তো, আর ঘুম থেকে জেগে উঠতো খুব কাক ডাকা ভোরে। তাই আগের মানুষগুলো ছিল বেশ স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ। তাদের দেহেও রোগবালাইও কম ছিল। তারা বেঁচেও থাকতেন অনেক বছর ধরে।

২.

রহমত আলী তার গ্রামে যেখানে তার বাড়িটি করেছেন তার আশেপাশের কয়েক কিলোমিটারে কোন বাড়িঘর ছিলনা। শুধু একটু দূরে মানিক মিয়া নামের এক দিনমজুরের পরিবার বসবাস করতো। বলা যায় সেই দিনমজুরের পরিবারই ছিল রহমত আলীর একমাত্র প্রতিবেশী। রহমত আলীর বাড়ির কোন কাজে লাগলে সেই দিনমজুরের পরিবারই এগিয়ে আসতো। রহমত আলী তার স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ও একমাত্র কন্যা'কে নিয়ে সুখেই ছিল। তবে রহমত আলী যেখানে বাড়ি করেছেন সেখানে অনেকেই দিনের বেলায় ভয়ে আসতে চাইতো না। কারণ এই বাড়ির জায়গাটিকে গ্রামের লোকজনেরা কেন জানি এড়িয়ে চলতো। তাই অনেকেই রহমত আলীকে নিষেধ করেছিল এই জায়গাটিতে বাড়ি নির্মাণ না করার জন্য।

কিন্তু রহমত আলী ছিলেন দুঃসাহসী ও দূরদর্শী একজন মানুষ। এছাড়া তিনি এই জায়গাটি নামে মাত্র দামে হরিদাস পালের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। অতি কম দামে পাওয়ায় রহমত আলী অনেকের নিষেধাজ্ঞা না শুনেই এই জায়গাটি কিনে নেয়। হরিদাস পাল ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। আর রহমত আলী ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক।

হরিদাস এই জায়গাটি বিক্রয়ের আগে এখানে তার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে নিয়ে বসবাস করতেন। কিন্তু হটাৎ হরিদাসের পুত্র রতন পাল ১৬ বছর বয়সে এক রাতে কোন এক অজানা রোগে মারা যায়। তখন তার মৃত পুত্র রতন'কে রাতে রাতে শশানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কাউকে না জানিয়ে চিতায় দাহ করে সৎকার করা হয়। এদিকে পুত্রের মৃত্যুর শোক সইতে না পেরে হরিদাস পালের স্ত্রী রানি পালও কয়েকদিন পর মারা যায়। এরপর হরিদাস পাল একা হয়ে পড়েন এবং মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তিনি তার বসত ভিটাটি রহমত আলীর কাছে বিক্রি করে লাপাত্তা হয়ে যান। শোনা যায়, এই জায়গাটি হরিদাস পাল অতি কম দামে রহমত আলীর কাছে বিক্রি করে দিয়ে রাতের আধারে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে হরিদাসকে আর কোনদিন এই গ্রামে দেখা যায়নি। এছাড়া হরিদাস পালের নিরুদ্দেশ হওয়ার পর এই জায়গাটি নিয়ে অনেক গুজব রটে। লোকের মুখে শোনা যায়, রহমত আলী যেখানে বাড়ি করেছেন তার পাশেই ছিল একটি আম বাগান। আর সেই আম বাগানের একটি আম গাছে নাকি একবার এক কিশোর আর এক কিশোরীর জুলন্ত লাশ পাওয়া গিয়েছিল। যদিও একথাটি রহমত আলীর কাছে অস্বীকার করেছিল জায়গাটির আগের মালিক হরিদাস পাল।

৩.
প্রতিদিনকার মত রসুলপুর গ্রামে সন্ধ্যা নামে। অজপাড়া গাঁ। সন্ধ্যা নামলেই নিশি ভর করে এই গাঁয়ে। এদিকে দোতলার বাড়ির নিচতলায় রহমত আলী থাকেন তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে। বাড়ির নিচতলার বিল্ডিং এর কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হলেও, দোতলার ইউনিট এখনো পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি।

দোতলার ইউনিটে অর্ধকাজ করে ছাদ ঢালাই দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। নিচতলা থেকে দোতলার উঠার সিড়ি করা হলেও দোতলা থেকে দোতলার ছাদের সিড়ির ঢালাই এখনও দেওয়া হয়নি। যদিও দোতলার দুটি রুমের কাজ অর্ধভাগ করে রাখা হয়েছে এবং বাকী দুটি রুমের কাজ এখনও বাকি রয়েছে। রহমত আলীর একমাত্র পুত্র আহমদ আলী। আহমদ আলী ছিল দারুণ সাহসী। তার বয়স ছিল ১৯ বছর। তার ঠিক ৪ বছরের ছোট তার বোন রোকসানা বেগম। আহমদ আলী সব সময় তার বাবার সঙ্গেই এক বিছানায় ঘুমাতো। অন্যদিকে রোকসানা তার মায়ের সঙ্গেই আরেক বিছানায় ঘুমাতো। প্রতিদিন সন্ধ্যা নামার পরেই রহমত আলীর পুরো বাড়িতেই যেন নিস্তব্ধ নিরবতা নেমে আসতো। একদিন রাতে রহমত আলী ক্লান্ত থাকায় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্ত তার ছেলে আহমদ আলীর ঘুম আসছিলনা সেদিন। ঘুম না আসায় আহমদ আলী ঘাড় কাত করে পাশের রুমের দিকে তাকিয়ে দেখলো তার মা এবং বোন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এদিকে তার পাশে থাকা তার বাবার নাক ডাকার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে সে। আহমদ জানে তার বাবা যখন গভীর ঘুমে থাকে, তখন তার নাক ডাকা শুরু হয়।

আহমদের কিছুতেই ঘুম আসছে না। সে এপাশ ওপাশ করছে। হঠাৎ করে আহমদ তার বাবার নাক ডাকার সঙ্গে ধুপধাপ আওয়াজ শুনতে পেল। প্রথমে সে ধুপধাপ আওয়াজটাকে আমলে নেয়নি। কারণ তাদের বাড়ির পাশে বিশাল একটা আমবাগান আছে। সেই আমবাগানের কয়েকটি গাছ আবার অনেক বিশাল বিশাল লম্বা। ফলে সেই লম্বা আমগাছগুলো তাদের ছাদের উচ্চতার চেয়ে অনেক উপরে থাকায়, সেসব আমগাছের কিছু মরা ডালপালা মাঝে মাঝেই উপর থেকে তাদের ছাদে এসে পড়ে। ফলে এসব ছোট ছোট ডালপালা ছাদে পড়লেই এমন ধুপধাপ আওয়াজ শোনা যায়। কিন্তু আজকের ধুপধাপ আওয়াজটা আহমদের কাছে কেমন যেন লাগছে? এরকম অদ্ভুত বিকট ধুপধাপ আওয়াজ আগে সে কখনোই শুনেনি। সে চিন্তায় পড়ে গেল এটি কিসের আওয়াজ? হঠাৎ তার চিন্তার মাঝে আবারও ভাজ পড়লো যখন সে রিনিকঝিনিক ঝনঝনানি শব্দ শুনতে পেল।

তার কাছে মনে হল তাদের বাড়ির ছাদে কেউ নুপুর পড়ে হাটছে হয়তো বা লাফাচ্ছে। সে এরকম অদ্ভুত শব্দ শুনে ভাবলো কোন চোরটোর হয় তো বা শিকল নিয়ে ছাদে হাটছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার মনে হল তাদের রসুলপুর গ্রামে তো কোন চোর নেই। কারণ এই গ্রামের সবাই সৎ ও স্বচ্ছল। তাদের গ্রামে আজ পর্যন্ত সে কোন চুরি হতে দেখেনি। তাই আহমদ চোরের বিষয়টি মাথা থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিলো। আহমদ ভাবতে লাগলো যদি চোর না হয়। তাহলে এত ধুপধাপ আওয়াজ হচ্ছে কেন। তাও ধুপধাপ পায়ের আওয়াজের সাথে নুপুরের আওয়াজ হচ্ছে একই ছন্দে একই তালে। শব্দটা বড়ই অদ্ভুত এবং ভয়ংকরও বটে। মনে মনে বিড়বিড় করলো আহমদ।

৪.

শুয়ে শুয়ে চিন্তিত আহমদ। নুপুরের আওয়াজের ছন্দের সাথে মিল রেখে ধুপধাপ আওয়াজ হচ্ছে। তাও তালে তালে ছন্দ মিল রেখে। সে এবার ভয়ে পেয়ে গেল। তবে আহমদ ভয় পেলেও সে ছিল খুব সাহসী। সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো এই নিশি রাতে সে ছাদে যাবে এবং ছাদে কি আছে তা সে দেখবেই। তার মনে প্রশ্ন জাগলো- কেনইবা এত ছন্দের তালে তালে ধুপধাপ রিনিকঝিনিক আওয়াজ হচ্ছে। আর সেটা দেখার কৌতুহলই আহমদকে ঘিরে ধরলো। আহমদ সিদ্ধান্ত নিলো সে একাই যাবে ছাদে কাউকে না জানিয়ে। কারণ এত রাতে সে তার বাবা-মার অনুমতি চাইলে তারা তাকে যেতে দিবেনা। কারণ অজপাড়া গাঁয়ে রাতের বেলায় কত অজানা ভয়ই থাকে। সে সাথে এই বাড়ির জায়গাটি নিয়েও রয়েছে নানান রকম মুখরোচক অলৌকিক ঘটনা আর রটনা।

আহমদ বিছানা থেকে উঠে দাড়ালো। তারপর সে ভাল করে খেয়াল করে দেখলো তার মা-বাবা-বোন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তখন সে পা টিপেটিপে ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসলো। তখনও রিনিকঝিনিক আওয়াজের সাথে ধুপধাপ শব্দের ছন্দতাল বেজেই চলেছে। ছাদের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো আহমদ।

বারান্দার শেষ মাথায় আসার পর আওয়াজটা আরও বেড়ে গেল। আহমদ হাটিহাটি পা পা করে সিড়ির দিকে পা বাড়ালো। সিড়ি দিয়ে আহমদ যতই উপরে উঠছে নুপুরের আওয়াজ আর ধুপধাপ আওয়াজ ততই তার কাছে চলে আসছে। মিটিমিটি ভয়ে দোতলায় উঠলো আহমদ। সে দোতলার পুরো ইউনিউট ঘুরে দেখলো। কিছুই দেখতে পেল না সে। এদিকে আহমদের মনে যেমন ভয় কাজ করছে ঠিক তেমনি কৌতুহলও কাজ করছে। এমন ভয়ংকর পরিস্থিতিতে কৌতুহলই আহমদকে টেনে নিয়ে এসেছে এখানে। এখনও আহমদ সেই নুপুরের ধুপধাপ আওয়াজের ছন্দ শুনতে পাচ্ছে। এবার আহমদ বুঝতে পারলো আওয়াজটা দোতলায় নয়, বরং দোতলার উপরের ছাদ থেকে আসছে। আহমদ চিন্তায় পড়ে গেল। কারণ দোতলার উপরের ছাদে যেতে হলে চিকন একটি মই বেয়ে উপরে উঠতে হবে। আর এই মইটি বেয়ে উঠা এতটা নিরাপদও নয়। তবে কৌতুহল মানুষকে অনেক সময় অনেক দুঃসাহসিক ও বিপদজনক কাজেও ঠেলে দেয়। আহমদের বেলায় এখন তেমনটায় ঘটছে। আহমদ কোন কিছুর তোয়াক্কা না করেই মই বেয়ে দোতলার ছাদের উপরে উঠতে থাকলো। মই বেয়ে দোতলার উপরের ছাদে উঠে উঁকি দিয়ে আহমদ যা দেখলো তার জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল। সে যা দেখলো তা দেখে তার সারা শরীরের শিহরণ বয়ে গেল। সে অনেকটা আচমকা ভয় পেয়ে গেল। এমন শিহরিত দৃশ্য আগে কখনো সে দেখেনি।

৫.

আহমদ তাদের দোতলার উপরের ছাদের সেই অদ্ভুত ভয়ংকর দৃশ্য দেখে আতংকিত হয়ে আচমকায় মই থেকে একটু হলে নিচে পড়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু ভাগ্যিস সে মইয়ের একটি লোহা দন্ডকে আকড়ে ধরে নিজেকে নিচে পড়ে যাওয়া থেকে সামলে নিলো। এমন ভয়ংকর সময়ে আহমদের বুকের ভেতরেটা ভয়ে ছ্যাত করে উঠলো। যদি সে এখন মই থেকে পড়ে যেতো, তাহলে তিন তলার উচ্চতা থেকে পড়ে গিয়ে তার নিশ্চিত মৃত্যু হতো। এই কথা ভাবতেই আহমদের কপালে একটি চিকন শীতল ঘাম দেখা দিল।

আহমদ নিজেকে এবার সামলে নিয়ে তিনতলার ফ্লোরে উঠে দাড়ালো। কিন্তু এবার সে যে ভয়ংকর শিহরিত দৃশ্য দেখলো। তা দেখে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলো না। নিমেষেই সে মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে সেখানেই পড়ে গেল। এরপর আহমদের নিথর দেহ পড়ে রইলো দোতলার উপরের ছাদে তিনতলার ফ্লোরে।

৬.

-কি রে আহমদ! উঠ উঠ! দুচোখ মেলতেই চোখ ভেজা পেল আহমদ। সে দেখলো তার দিকে উপর থেকে তাকিয়ে আছে তার বাবা-মা ও বোন। সে বিছানায় শুয়ে। কতক্ষণ সে অজ্ঞান ছিল সে বুঝে উঠতে পারলো না। কিন্তু ছাদের ভয়ংকর ঘটনায় সে এখনও কাপছে। তার বিছানার পাশেই বসা তার বাবা তাকে বলে উঠলো- কিরে তুই এত রাতে ছাদে গিয়েছিলি কেন? তুই জানিস না এই গ্রামে রাতে কোথাও কোন কারেন্ট থাকে না। অন্ধকার রাতে তুই কেন ছাদে গেলি? আহমদ তার বাবা মা বোনকে পাশে পেয়ে কিছুটা অভয় পেল। এরপর সে ছাদে যা দেখলো সেই ঘটনা বলা শুরু করলো- আব্বা আপনারা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন! তখনও আমার ঘুম আসছিলো না।

আমি ঘুমহীন চোখে যখন শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম। তখন হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পায়। মনে হল কেউ যেন আমাদের ছাদের উপরে শিকল আর নুপুর পড়ে লাফালাফি করছে। প্রথমে ভেবেছিলাম চোর। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল আমাদের এলাকায় তো চোর নেই। তারপর অদ্ভুত শব্দটা শুনে আমার কৌতুহল জাগলো। শব্দটা ছাদের উপর অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছিলো। তাই আপনাদের কাউকে না ডেকে চুপিচুপি দরজা খোলে আমি একা একা ছাদে চলে যাই।

তারপর দোতলার সবগুলো জায়গায় গিয়ে দেখলাম কোন কিছুরই আলামত নেই। দোতলায় থেকে নেমে যাবো ঠিক ঐ সময় আবারও আওয়াজটা শুনতে পেলাম।

এবার নিশ্চিত হলাম অদ্ভুত বিকট ধুপধাপ নুপুরের আওয়াজটা দোতলার ছাদ মানে তিনতলার ফ্লোর থেকে আসছে। আমি তখন কিছুটা ভয় পেয়ে পেলাম। তারপর ভয়ে ভয়ে তিনতলার ছাদে যা দেখলাম। তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। এই পর্যায় এসে আহমদ থামলো। তার বিছানার পাশে থাকা টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে পানি খেয়ে আবারও বলা শুরু করলো সে।

আমি মই বেয়ে উঁকি দিতে দেখলাম- জামাই বউ সেজে দুজন কিশোর কিশোরী সিকুত খেলছে। জামাইয়ের বেশে কিশোরের পায়ে ছিল মেয়েদের চুড়ির মত করে শেকলের আংটা পড়া আর বউয়ের বেশে কিশোরীর পায়ে ছিল রুপার নুপুর পড়া। ফলে ওরা এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সিকুত খেলতেছিল বলে নুপুর ও শেকলের আওয়াজের সঙ্গে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছিলো। আর তাই নিচতলা থেকে মনে হচ্ছিলো কেউ যেন ছন্দের তালে তালে লাফাচ্ছে। আমি তাদের সিকুত খেলা দেখছিলাম তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জামাই বউ সাজা কিশোর কিশোরী আমার দিকে ফিরে তাকালো। তখন আমি তাদের বিভৎস চেহেরা দেখে চরম আতংকে উঠি। কিশোরীর মুখে অনেক কাটা কাটা দাগ। আর সেই কাটাদাগের মাঝ থেকে ছোপ ছোপ রক্ত পড়ছিল। মনে হল কেউ একটু আগেই ঐ কিশোরীকে চাবুক দিয়ে বেধড়ক পিঠিয়েছে। আর কিশোর ছেলেটের হাতে ও পায়ে অনেক জমাট বাধা রক্তের দাগ ছিল। আমাকে দেখার পর তারা বিকট কান্নার চিৎকার দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

এরপর পেছন ফিরতেই দেখি আমাদের বাড়ির পাশের আমবাগানের সবচেয়ে বড় গাছের মোটা ডালটাতে দুইজন কিশোর কিশোরী গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে। দুইটা লাশের চেহেরা ছিল ভয়ংকর কুৎসিত। আর এটা দেখার পর আমার মাথাটা জিম মেরে উঠলো। তখন আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, প্রচন্ড ভয়ে পেয়ে আমি ফ্লোরে পড়ে গেলাম।

এরপর আমার আর কিছুই মনে নেই।

৬.
রহমত আলী মনোযোগ দিয়ে তার ছেলে আহমদ আলীর কথা শুনলো। রহমত আলী তার ছেলের মুখে এমন ভয়ংকর কাহিনী শুনে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তবে সেটা তার সন্তান ও পরিবার কাউকে বুঝতে দিলো না। রহমত আলী তখন পরিবারের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো চলো সবাই এখন ঘুমিয়ে পড়ি। অনেক রাত হয়েছে। কালকে সকালে উঠে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত ভাবা যাবে। একথা বলে ঘরের সকল আলো জ্বালিয়েই তারা শুয়ে পড়লো এবং তারা গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়লো।

ফজরের আজানের ডাক শুনে ঘুম ভাঙ্গলো রহমত আলীর। রহমত আলী ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়তে গেল মসজিদে। মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে ফেরার পথে তার প্রতিবেশী দিনমজুর মানিকের বাড়িতে গেল। মানিকের বাড়িতে গিয়ে মানিককে জাগ্রত অবস্থায়ই পেলেন তিনি। রহমত আলীর বয়স ৫০ এর উপরে হলেও মানিক মিয়ার বয়স প্রায় ৭০ এর কাছাকাছি। মানিক মিয়া কর্মঠ ও পরিশ্রমী বলে এখন জোয়ানই আছে। রহমত আলী মানিক মিয়াকে জিজ্ঞাসা করলো- মানিক ভাই তোমার কাছে জরুরি একটা তথ্য জানার জন্য আইছি। তুমি যদি সত্যি কথা কও তাহলে আমার খুব উপকার হইবো। তুমি তো জানো আমি বাড়িটা কিনছি ৪/৫ বছর হইবো। কিন্তু বাড়িটা কেনার সময় তুমি আমারে বার বার বারণ করছিলা, যেন আমি এই বাড়িটা না কিনি। তুমি কি কইবা কেন তুমি আমাকে তখন মানা করছিলা?

একথা শোনার পর মানিক মিয়া বললো- শোনো রহমত, তুমি খুব ভালা মানুষ। মানুষের পয়সা হলে মানুষের অহংকার বেড়ে যায়। কিন্তু তোমার মাঝে আমি কোন অহংকার দেখি নাই। তাই তোমার কাছে আর কোন কথা আমি লুকাবোনা। শোনো তাহলে কেন আমি তোমাকে এই বাড়িটি কিনতে নিষেধ করেছিলাম।

একথা বলার পর মানিক মিয়া বলা শুরু করলো।

হরিদাস পাল মানুষ হিসেবে ভাল ছিল। সে ছিল হিন্দু জমিদারের নাতির ঘরের পুতি। তাই বংশগতভাবেই সে আভিজাত্য ও সম্মান নিয়া চলাফেরা করতো। সে অপমান ও হানিকর বিষয়কে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখতো। তার সম্মান হানি হবে সে এমন কোন কাজ কখনোই করতো না। সে খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিল। সেই হরিদাসের একটা মাত্র সন্তান ছিল। তার নাম ছিল রতন পাল। সে তার সন্তানকে খুব ভালবাসতো। আবার সন্তান কোন ভুল করলে তখন চরম শাসনও করতো।

একদিন হরিদাসের ছেলে রতন তার বাবা-মাকে না জানিয়ে পূজা নামের এক মেয়েকে ভাগিয়ে এনে বিয়ে করে ফেলে। কিন্তু রতনের বাবা হরিদাস পাল সেটা মেনে নিতে পারেনি। তাই তিনি তার ছেলেকে জোর করে ঘরে বন্দী করে রাখে এবং পূজা মেয়েটিকে প্রচন্ডভাবে প্রহার করে এবং অমানবিক নির্যাতন করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন পূজা মেয়েটি সেই অপমান ও নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পাশের আমবাগানের একটি শক্ত ডালে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। এরপর পূজার আত্মহত্যার কথা শুনে রতনও ঘরের দরজা ভেঙ্গে বাহিরে বের হয়ে আসে এবং সেও সেই আমবাগানের একই গাছের একই ডালে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। দুটি আত্মহত্যার ঘটনায় ঘটে একই দিনের সন্ধ্যাবেলা ও রাতে। ফলে এই ঘটনা গ্রামে জানাজানি হওয়ার আগেই নিশি রাতের আধারে শশানে গিয়ে হরিদাস তার পুত্র রতন আর পূজার লাশের সৎকার করে ফেলে। আর সকালে উঠে সে পাড়ার সবাইকে জানিয়ে দেয় তার ছেলে রতন এক অজানা রোগে মারা গেছে। তাই সেই রোগ যেন সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তাই রাতের আধারেই তার ছেলের সৎকার করা হয়েছে।

তবে এই কথা গ্রামের সবাই বিশ্বাস করলেও আমি বিশ্বাস করেনি। কারণ কিছু বিষয় আমার চোখের সামনে ধরা পড়েছিল। পরে হরিদাস আমার কাছে হাতজোড় করে বলেছিল আমি যেন আসল ঘটনা কাউকে না বলি। আমি তার কথা রেখেছিলাম।

পরে আমি তার কথা গোপন রাখায় সে আমাকে তার এ বিঘা জমি লিখে দিয়েছিল। যেটাতে এখন আমি চাষবাস করে খায়, ঐ জমিটায় হরিদাস আমাকে সাফকবলা করে দিয়েছিল। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই হরিদাসের স্ত্রী পুত্রের শোক সইতে না পেরে হার্টএটাক করে মারা যায়। হরিদাস তখন খুব একা হয়ে যায় এবং মানসিকভাবেও ভেঙ্গে পড়ে।

এরপরেই হরিদাসের ঐ বাড়িতে এবং তার আশেপাশের জায়গায় ঘটতে থাকে কিছু ভয়ংকর অদ্ভুত ঘটনা। ঐসব অদ্ভুত ঘটনার পর হরিদাসের বাড়ির ঐ আমবাগানের পাশ দিয়ে কেউ আর রাতের বেলায় যাতায়াত করতে চাইতো না। কারণ তখন অনেক পথচারীরা মাঝে মাঝে আমবাগানের একটি গাছের ডালে দুইটা ঝুলন্ত লাশের ছায়া দেখতে পেত। তাই এই ঘটনা সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে সবাই ভয়ে ওই বাড়ির আশপাশ এড়িয়ে চলতো। এমতাবস্থায় তখন হরিদাস আরও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লো এবং অর্ধ পাগল হয়ে গেল। এরপর সে ঐ বাড়ি'সহ আমবাগানও তোমার কাছে বিক্রি করার জন্য তোরজোড় শুরু করলো।

পরে তুমি যখন এলে এই বাড়ি কেনার জন্য তখন আমি তোমাকে বার বার আকার ইঙ্গিতে নিষেধ করেছিলাম বাড়িটি না কেনার জন্য।

কিন্তু তুমি তো আমার কথা শুনলেনা।

হরিদাস মূলত এই ভৌতিক ঘটনা ধামাচাপা দিতেই তোমার কাছে বাড়িটি বিক্রি করে দিয়ে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আমার তখনই ধারণা হয়েছিল সে আর কোনদিন এই গ্রামে আর ফিরবে না। এরপর তো আজ কত বছর পেরিয়ে গেল এই গ্রামে হরিদাস আর ছায়াও মেলেনি।

এই বলে মানিক মিয়া তার কথা বলা শেষ করলেন।

লেখক পরিচিতি

গোলাম মোসাব্বির মূলত 'রাকিব মোসাব্বির' নামে বেশি জনপ্রিয়। তিনি বাংলা সঙ্গীতের একজন জনপ্রিয়, খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী, সুরকার, গীতিকার ও সঙ্গীত পরিচালক। তিনি মূলত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি তার পরিচিত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে মাল্টি ট্যালেন্ট হিসেবেই সমাদৃত। তিনি এই পর্যন্ত অসংখ্য জনপ্রিয় গানের সুরস্রষ্টা ও সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নিজের সঙ্গীত ক্যারিয়ার গড়েছেন। ২০৫ সালে ক্লোজ আপ ওয়ান দিয়ে তার মিডিয়া যাত্রা শুরু হলেও ২০০৭ সালে ‘যারে আমার মন’ গানটি দিয়ে অফিসিয়ালি তার সঙ্গীত ক্যারিয়ার শুরু হয়। এছাড়া তিনি একাধারের লেখক, কলামিস্ট ও প্রযুক্তি উদ্যোক্তা। তিনি সঙ্গীত ও সাহিত্যের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করেছেন মিডিয়া কোম্পান, আইটি কোম্পানি ও অডিও রেকর্ড লেবেল কোম্পানি।

'গল্পপুথি' প্রকাশনী